স্বাক্ষর

সুদীপ্ত দাস

- পাথরের উপর লেখাটা বোধহয় বাংলাতেই ছিলো ।
- হতে পারে, তবে এদিককার স্থানীয় ভাষাতেও হতে পারে, কারণ আসাম বা অন্যান্য উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোতে বাংলা হরফই ব্যবহার করা হয় । কোনো বাঙালীর পক্ষে অত উপরে একটা প্রত্যন্ত প্রান্তে পাথরে খোদাই করে লেখাটা নেহাতই অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে ।
- তাও, আমার কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে ওটা বাংলাতেই লেখা । জয়, চলো না, কাল আরেকবার জায়গাটাতে যাবো - একটু সকাল সকাল বেরোবো, তাহলে অনেক্ষণ ধরে জায়গাটা এক্সপ্লোর করা যাবে।
- উফ - রিকা, তোমার সাথে আমি এক্সপ্লোরেশনএ বেরোই নি ডার্লিং, আমরা হানিমুনএ এসেছি এখানে, স্রেফ দুজন দুজনকে আমরা এক্সপ্লোর করবো, আর তার জন্য হোটেলের ঘরই অনেক ভালো, কি বলো?
- না লক্ষ্মীটি, প্লিস চলো, দেখো নতুন বউকে কখনো দুঃখ দিতে নেই।
- ব্বাব্বা, গত চার বছর ধরে তোমার সাথে কম তো হলো না, কিছুই আর নতুন নেই, সেই একই চোখ, একই কান, একই ঠোঁট, একই বু ....
- চুপ, যত বাজে কথা, তুমি যাবে নাকি বলো, নাহলে আমি কাল একাই যাবো। আমাদের সামনের ঘরের সাহেবটা এমনিতেই আমাকে দেখলে একটু কেমন কেমন করে, ওকে বললেই হবে, আমার সাথে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পর্যন্ত যেতে রাজী হবে । ভাবছি ওর সাথেই চলে যাবো কাল।
- কী সঙ্ঘাতিক মেয়ে রে বাবা। শেষে এই ভাবে গলায় দড়িটা পড়বে কে জানতো।
- কি বললে?
- না, না, আমিই কাল যাবো তোমাকে নিয়ে।
- ইয়েস, দ্যাটস লাইক এ গুড বয়।

[২]

পরের দিন খুব ভোরে রিকা তৈরী হয়ে গেলো। জয় ত' ভোরে উঠবেনা ঠিকই করেছিলো । তাই বিছানাতে শুয়ে শুয়ে গরিমশি করছিলো - আর আধ-বোঝা চোখের ফাঁক দিয়ে রিকাকে দেখছিলো। সকালের নরম রোদ রিকার সারা শরীরে একটা মোলায়েম প্রলেপ বুলিয়ে যাচ্ছে। সদ্য স্নান করে এলো চুলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রিকা, গামছা দিয়ে ধীরে ধীরে চুলের জল ঝারছে আর আবৃত্তি করছে, "পথ বেঁধে দিলো বন্ধন হীন গ্রন্থী, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী"। হোটেলের কাঁচের জানালা দিয়ে কাছেই দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা কত চূড়ো - সবুজ নীল আর সাদার কি সুন্দর মিশ্রন - অনেক যত্ন করে প্রকৃতি রংগুলোকে মিশিয়েছে। বরফের গা আলোর ঝর্ণা ধারায় ধুয়ে গেছে।

ছোট্ট শহর গ্যাংটক এখনো জেগে ওঠে নি। এই সুন্দর সকালে কোথায় লেপের মধ্যে ঢুকে নতুন বউএর সাথে অভিসারের আলোচনা হবে, তা না, গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে হবে সাংগু লেক, তারপর সেখান থেকে হাঁটা পথে অনেকটা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে যেতে হবে একটা জনবসতিহীন প্রত্যন্ত উপত্যকাতে বউএর মুখে হাসি ফোটাতে। সত্যি, বিয়ে থা না করে বছর সাতেকের প্রেমটা আরো কিছুদিন বাড়ালে বোধহয় মন্দ হতো না। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রিকার বকুনি খেয়ে এবার সত্যিই

সত্যিই জয়কে উঠতে হলো । স্কুলের দিদিমনি যেমন ভাবে নার্সারির বাচ্চাদের পাখী পড়ানোর মত করে কবিতা মুখস্ত করায়, তেমনই জয়কে দিয়ে রিকা প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যেই সব কিছু করিয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলল। সাংগু লেক পৌঁছোতে বেশীক্ষণ লাগলো না। অক্টবরে ঠান্ডাটা একটু একটু করে পড়তে শুরু করেছে - তাই এখন সিজন শেষ হয়ে এসেছে - ট্যুরিস্টদের ভীড় অনেকটা কম । তাও সাংগু লেক অবধি তো কয়েকটা লোকজন অন্তত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তারপর তাদের যে অগস্ত্য যাত্রায় বেরোতে হবে, তাতে লোকজন দেখাটা অনেকটা ভাগ্যের ব্যপার। জয় মনে মনে আশা করে বসে আছে যে সাংগু লেকে পৌঁছে প্রছন্ড ঠান্ডা লাগবে, তারপর হয়তো কিছুটা ভয় পেয়ে রিকা নিজেই বলবে, "চলো ফিরে যাই"। তাই জয় কিছুটা আশ্বস্ত হয়েই ট্যাক্সিতে বসেছিলো।

কিন্তু কোথায় ঠান্ডা, যত উপরে উঠছে ওরা, রিকার উত্তেজনা যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে। একটা ভালো ক্যামেরা সাথে নিয়েছে। আগের দিন ওদের ক্যামেরাটা মোক্ষম জায়গাতে গিয়ে বাজে বায়না শুরু করেছিলো, তাই পাথরের উপর খোদাই করা লেখাটার কোনো ফটো নিয়ে আসা যায় নি। বিকেল নাগাত ছোটো একটা মিলিটারীর দলের সাথে ভিড়ে গেছিলো তারা গতকাল। যখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় তখন তারা পৌঁছেছিলো সেই পাথরের সামনে। অন্ধকার হয়ে এসেছিলো, তাই পাথরের গায় কি লেখা ছিলো ভালো করে বোঝা যাচ্ছিলো না। ফটোও তোলা গেলো না। তাই আজ আবার যেতে হচ্ছে। জয়ের মনে হচ্ছিলো কেন যে দেখা হলো ঐ ঘর ছাড়া উড়ণচন্ডীগুলোর সাথে। ও ভালোই বুঝতে পারছিলো সাথে রিকা ছিলো বলেই মিলিটারীগুলো ওদের এতো পাত্তা দিচ্ছিলো। আর রিকাও তো একেবারে গাঁট ছেঁড়া ফকির - কোনো ফিকির পেলেই হলো, টই টই করতে বেড়িয়ে পড়বে - গত ছ সাত বছর ধরে দেখছে - এই 'চড়ে' বেড়ানোর স্বভাবটা তার কিছুতেই গেলো না।

[৩]

- আমি ঠিকই বলেছিলাম - দেখো, বাংলাতেই লেখা ।
- হ্যাঁ ঠিকই বলেছো - কোনো ছুঁচোলো পাথর দিয়ে কেউ খোদাই করেছে। তবে অনেক দিন আগেকার লেখা এটা - কারণ, দেখো - পাথরের অনেকটাই শেওলাতে ঢেকে গেছে।
- তুমি পড়তে পাড়ছো?
- না, একদমই না - তবে লেখাটা যে বাংলাতে সেটা নিশ্চিত কারণ কয়েকটা বর্ণ চেনা যাচ্ছে।

হঠাৎ জয় খুব উৎসাহ নিয়ে লেখাটা উদ্ধার করতে বসলো। অনকেটা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে অপ্রত্যাশিত একটা আনন্দে তার মনটা ভরে গেলো। প্রথমত রিকা খুবই খুশী হয়েছে , সেটাই জয়ের কাছে খুব আনন্দের। তাছাড়া ব্যপারটা ভাবতেই তার কেমন যেন শিহরণ জাগছে মনে। নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হবার মন নিয়ে সে আজ সকালে ঘর ছেড়েছিলো। পথে আসতে আসতে দুদিকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তার মনটা অনেক বদলে গেলো। সত্যই তার মনে হলো, "আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী"। পথের দুর্গমতা, বাতাসে তুষারের পরশ, অনেক নীচে সাংগু লেক - সব কিছু মিলিয়ে তার মধ্যে একটা স্বতঃস্ফুর্ত অভিযাত্রী জেগে উঠলো। রিকাকে বললো, "তুমি অনেক গুলো ক্লোস থেকে ফটো তুলে নাও, আমি দেখছি কিছু উদ্ধার করা যচ্ছে কিনা" ।

প্রায় ঘন্টা খানেকের প্রচেষ্টায় ওরা দুজন মিলে যেটুকু উদ্ধার করতে পরলো তা হলো -

ভারত বর্ষ দেখিয়াছি আমি তোমার ওদুটি চোখে,
বহিয়াছো তুমি সিন্ধু আমার বঙ্গ হৃদয় লোকে।
পাঞ্জাব আজি হরণ করেছে বাংলার প্রাণ মন;
হৃদয়ে রয়েছে "গুরুজী কি ফতেহ" পরম সংগোপন।।
অধরে তোমার কাশ্মীর আসি রচিয়াছে কত সুধা,

পরশ তোমার মিটায়েছে মোর কত শতকেত ক্ষুধা।।
কিরীটে তোমার তুশার শৃঙ্গ, চরণে সাগর বেলা,
চাহনীতে তব সৃষ্টি-ধংস-প্রলয়-ঝঞ্ঝা খেলা।।

এর পরে কি লেখা রয়েছে আর পড়া যাচ্ছিলো না। শেষে বোধ হয় কোনো নামও ছিলো, কিন্তু সেই জায়গাগুলো শেওলাতে পুরো ঢাকা পরে গেছে। অনেক কষ্ট করেও কিছু উদ্ধার করা গেলো না। রিকা অনেক গুলো ফটো নিয়ে নিলো, হয়তো কিছুটা লেখা এনলার্জ করলে আরো স্পষ্টা হতে পারে। লেখাটার সাহিত্যগত মান বিবেচনা করার কথা মনে আসার আগে জয়ের কয়েকটা ব্যপার একটু অসংলগ্ন লাগলো। যেমন, কবিতাটা কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা - এবং এতে এত বার পাঞ্জাবের উল্লেখ কেন? "গুরুজীকি ফতেহ" এই কথাগুলো পাঞ্জাবী ছাড়া কেউ ব্যবহার করে না। রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী" ছাড়া কোনো বাংলা কবিতাতে এই কথাগুলো তার চোখে আসে নি। কয়েকটা লাইন থেকে মনে হয় কবিতাটা প্রেমের - প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে কোনো প্রেমিকের লেখা হয়তো। কিন্তু ভারত বর্ষ উল্লেখ করে কেউ নিশ্চই প্রেমিকাকে উপমিত করে না। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বেলা প্রায় পড়ে এলো। রিকাকে প্রচন্ড বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো। হোটেল থেকে নিয়ে আসা খাবরের প্যাকেট থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে ওরা আবার সাংগু লেকে ফিরে এলো। পাথরের লেখাটা দেখে দুজনেই এত অবাক হয়ে গেছে যে তাদের মনে সব থেকে স্বাভাবিক প্রশ্নটাই উদয় হলো না। তারা একবারও ভেবে দেখলো না লেখাটা কে কি অবস্থায় ঔ প্রত্যন্ত প্রান্তে লিখে রেখেছে - কবেই বা লেখাটা লেখা হয়েছে !!

সাংগু লেক থেকে ট্যাক্সি করে ফেরার পথে অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রিকাই প্রথম প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, এটা কে লিখলো বলো তো?"। জয় একমনে একটা কাগজে টুকে আনা লাইনকটার দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, "আমি সেটা ভাবছি না, আমার কাছে আরো বিস্ময়ের ব্যপার হলো কবিতার বিষয় বস্তু। যিনি লিখেছেন বাংলাতে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিলো; তবে কবিতার বাকি অংশটা না জানা গেলে বা কবির মানসিক অবস্থার কোনো হদিস না পাওয়া গেলে মথামুন্ডু কিছুই বোঝা যবে না"।

- কেন? না বোঝার কি আছে? এটা তো স্পষ্ট যে যিনি লিখেছেন তিনি একজন স্বদেশী, কারণ কবিতাতে ভারত বর্ষ বলে একটি মেয়েকে কল্পনা করা হয়েছে । স্বদেশী যুগে তো এরকম এনেক কবিতাই লেখা হতো।
- কিন্তু স্বদেশী যুগে কোনো দেশাত্মবোধক কবিতায় লেখা হতো না, "অধরে তোমার কাশ্মীর আসি রচিয়াছে কত সুধা"। আর তাছাড়া সব কবিতাতেই বলা হতো, "আমি ভারত বর্ষকে ভালোবাসি", বা সেরকম কিছু - কোথাও বলা হতো না, "তোমার ভালোবাসা মিটায়েছে মোর কত শতকের ক্ষুধা"। তবে যাই হোক, কবিতাটা স্বদেশী যুগে লেখা এবং যিনি লিখেছেন তিনি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন।
- কি করে বুঝলে?
- আচ্ছা, তোমার কি মনে পরে গত সাত বছরে তোমাকে নিয়ে এত কবিতা লিখেছি কিন্তু কখনো কি বলেছি যে তুমি আমার ভারত বর্ষ?
- না
- তাহলে দেখছো - যিনি লিখেছেন তাঁর কাছে তাঁর প্রেমিকার থেকে ভারত বর্ষই ছিলো বেশী গুরুত্বপূর্ণ!!
- তার মানে কি তুমি নিশ্চিৎ যে যিনি লিখেছেন তিনি তাঁর প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করেই এটা লিখেছেন?

- হ্যাঁ সে ব্যপারে আমি নিশ্চিৎ - না হলে উনি ঠোঁটের বর্ণনা দিতেন না। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণকে প্রেমিক রূপে রাধার উপসনা করার কথা আছে, মীরাবাঈ নাকি কৃষ্ণকে স্বামী রূপে কল্পনা করতেন, কিন্তু স্বদেশী যুগে কেউ ভারত বর্ষকে প্রেমিকা রূপে কল্পনা করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই ।
- তা না হয় মানলাম, কিন্তু এত জায়গা থাকতে বার বার পাঞ্জাবের কথা কেন?
- আমার মনে হচ্ছে যিনি লিখেছেন তিনি পাঞ্জাবী কোনো মেয়েকে ভালোবাসতেন। দেখো একটা লাইন আছে, "পাঞ্জাব আজি হরণ করেছে বাংলার প্রাণ মন"। এই লাইনটাতে মোটামুটি ব্যপারটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।
- বাব্বা, তুমি তো অনেক কিছুই আবিষ্কার করে ফেললে !!
- না গো, আরো অনেক কিছু জানতে বাকি আছে । কলকাতা গিয়েই তোমার দাদুর সাথে একবার দেখা করতে হবে ।

[৪]

জয়ের মুখে কবিতাটা শুনে সুধাংশুশেখর অনেকক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। যখন চোখ খুললেন সারা মুখে একটা নির্লিপ্ত প্রশান্তি। প্রচন্ড ঝড়ের অন্তে যখন আকাশ আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে থাকে - তখন হঠাৎ করে যেরকম প্রকৃতির মধ্যে একটা স্থিরতা এসে যায়, ঠিক তেমনই তাঁর বার্ধক্য ভরা সারা শরীরে হঠাৎ করে এক অপ্রত্যাশিত স্থৈর্য এসে তাঁকে ধ্যানোত্থিত কোনো যোগি ঋষির মত দেখালো। মানুষের শৈশবের চপলতা ধীরে ধীরে গাম্ভীর্যে পরিণত হয় জ্ঞান লাভের মধ্যে দিয়ে - মানুষ যত শেখে তত সে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে ওঠে। আজ যেন সেই প্রজ্ঞার আভাস পাওয়া গেল সুধানহশুশেখরের মধ্যে। আধো বোঝা আধো খোলা চোখে তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন

আসিয়াছো তুমি প্রথম প্রভাতে সূর্যের বাণী বহি,
হয়েছে আঁধার, এখনো তো তুমি কত যন্ত্রণা সহি
দাঁড়ায়ে রয়েছো হিমালয় সম আমার ভাইএর প'রে,
গঙ্গা যমুনা হয়েছে সৃষ্টি তোমার অশ্রু ঝ'রে,
তুমিই শক্তি, তুমিই শান্তি, আমার জীবন-বাহী,
আগে চলো প্রিয়ে, আমি শুধু হবো তোমার পথের রাহী ।।
ভারত বর্ষ দেখিয়ছি আমি তোমার ও দুটি চোখে,
বহিয়েছো তুমি সিন্ধু আমার বঙ্গ হৃদয় লোকে।।

রিকার দাদু আবৃত্তি শেষ করে আবার চোখ বুঝলেন। হতবাক হয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে রিকার বাবা রবি, মা বিপাশা, জয় আর রিকা ।

অনেক্ষণ করোর মুখে কোন কথা নেই ।

গ্যাংটক থকে ফিরে জয় রিকার দাদু শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর বোসএর সাথে দেখা করতে এসেছিলো। উনি স্বদেশী যুগের মানুষ, অনেক স্বদেশীর সাথে ওঁর যোগাযোগ ছিলো, তাই জয়ের মনে হয়েছিলো ওনাকে পুরো ব্যপারটা বললে হয়তো কিছু কতুন কথা জানা যেতে পারে।

জয়ই প্রথম নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললো, "দাদু, আপনি কি জানেন কবিতাটা কার লেখা?"।

শুধাংশুশেখর চোখ খুলেই প্রথম রিকার দিকে তাকালেন । আসতে আসতে বললেন, "রিকা তোর জীবনের সবচেয়ে বড় তীর্থটাই আজ তুই সেরে এসেছিস মা, তোর পুণ্যে আমারও প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে, আয় মা, আমার কাছে আয়, আমার বুকে শান্তি দিয়ে যা ...", বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এলো । রিকা কাছে গিয়ে দাদুকে জড়িয়ে ধরলো ।

- দাদু, তোমার কি হয়েছে? তুমি এরকম করছো কেনো?
- রিকা, অনেক কিছুই তোদেরকে বলা হয়নি, সাহস পাই নি, আজ সব বলবো। আজ আমার কোনো ভয় নেই।
- বলো দাদু, আমরা কিছুই বুঝতে পরছি না।
- অনেক দিন আগের কথা। বেয়াল্লিশের বিপ্লবের তোড়ে বাংলাদেশ একেবারে ভেসে গেছে। আমার বন্ধু প্রাণেশ, মানে প্রাণেশ চন্দ্র ঘোষ, অনেক দিন ধরেই নিখোঁজ, তার কিছুদিন আগেই বিপাশা বলে এক পাঞ্জাবী মেয়েকে সে বিয়ে করেছে। বিপাশাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাণেশ আর বিপাশা, ভারতের দুই প্রান্তের দুই চরমপন্থী বিপ্লবী সাত পাঁকে বাঁধা হয়ে যেন আরও বেশী ভয়ানক হয়ে গেছিলো, বোমা, বারুদ, বন্দুক, এই সবই যেন তাদের বেশী প্রিয়। আমার বাড়িতেই ওদের বিয়ে হয়েছিলো। পরীর মত সুন্দরী বিপাশাকে দেখলে মনেই হয় না যে ও এক সৈনিক, এক ভয়ঙ্কর বারুদের তোপ। বিয়ের রাতেই প্রানেশকে পালিয়ে যেতে হলো, সেই আমার সাথে প্রানেশসের শেষ দেখা। বিপাশা রয়ে গেলো আমার কাছে।

  বেশ কযেক দিন কেটে গেলো। বিপাশা আমাকে একদিন বললো, "ভাইয়া, আমি প্রাণেশকে অনেক দিন আগেই স্বামী বলে মেনেছি। অনেক দিন থেকেই আমরা একসাথে আছি", তারপর কিছুটা ইতস্তত করে বললো যে সে গর্ভবতী। আমিই ডাক্তার দেখিয়ে সব ব্যবস্থা করলাম। এক ছেলে হলো। আমি বললাম বিপাশাকে আরো কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে তারপর কিছু একটা ভাবতে। একদিন সকালে উঠে দেখি সে চলে গেছে। একটা চিঠি লিখে গেছে আমাকে, তাতে লেখা আছে,

  "ভাইয়া, দলের লোক ডাকতে এসেছিলো, যাচ্ছি, জানি না কবে ফিরবো। তুমি আমদের সন্ত ানের খেয়াল রেখো। আমরা মারা গেলে তুমিই আমদের ছোট্টো ভারত বর্ষকে আজান্দ হিন্দ বানিয়ে তুলো"

  তার পর কিছুদিন পরে প্রানেশ শিলং থেকে একটা চিঠি দিলো,

  "প্রিয় শুধু, সব খবর পেয়েছি। আমাদের আরো একটা উপকার করে দে, আমাদের ভারত বর্ষকে তুই তোর ভারত বর্ষ করে নে। আমাদের তো কোনো ঠিক নেই, কবে হয়তো গুলি খেয়ে মারা যাবো। বিপাশার কোনো খবর নেই। জানি না ও বেঁচে আছে কিনা। শেষ সময়ে যদি ওকে একবার কাছে পাই তাহলে খুব ভালো লাগবে। আমাদের পথে ভালোবাসা বড়ই নির্মম । মনেকে বড় দুর্বল করে দেয় রে।

  ভালো থাকিস। আমি হয়তো একদিন আমার ভারত বর্ষ কবিতাটা আবৃত্তি করতে করতে মারা যাবো। তোকে কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে, আমাদের ছোট্ট ভারত বর্ষকে আজাদ হিন্দ করে তুলতে হবে।

  ইতি প্রাণেশ"

শুধাংশুশেখর একটু থামলেন রিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার বন্ধু খুব ভালো কবিতা লিখত, ওদের বিয়ের দিনই আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলো বিপাশাকে নিয়ে লেখা ওর ভারতবর্ষ কবিতাটা।

প্রানেশের কোনো খবর অনেক দিন পাই নি, শেষ একবার চুয়াল্লিশের মাঝামাঝি শুনেছিলাম যে গ্যাংটকে ও ধরা পড়েছে কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ও পালিয়ে গেছে। আর কোনো দিন ওর কোনো খবর পাই নি"।

এইটুকু বলে উনি আবার থামলেন। এবার জয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অনেক বছর পর আবার খবর পেলাম ও সত্যি সত্যি ভারতবর্ষ কবিতাটা আবৃত্তি করতে করতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করেছে। শরীরে যতটা শক্তি ছিলো তা দিয়ে নিজের ভালোবাসার শেষ স্বাক্ষর রেখে গেছে দুর্গম পাহাড়ে"।

হঠাৎ সবার কেমন যেন অশ্বস্তি হতে লাগলো। শুধাংশুশেখর কোনো কথা বলছিলেন না। সব থেকে অধৈর্য দেখাচ্ছিলো রবিকে। এবার শুধাংশুশেখর রবির দিকে তাকালেন। একটু হাসলেন, তারপর বললেন, "ছোট্টো ভারাতবর্ষ আজ অনেক বড় হয়েছে, আজাদ হিন্দ হয়েছে ...", বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেলো। অঝরে কেঁদে ফেললেন রিকাকে জড়িয়ে ধরে বলে চললেন, "আমি কি কোনো দোষ করেছি বল? আমি শুধু তোর বাবাকে বলিনি যে ও আমার নিজের ছেলে না। কি করে বলতাম? কিসের পরিচয়ে আমি ওকে বড় করে তুলতাম? তোর ঠাকুমা সব জেনেই আমাকে বিয়ে করেছিলো। আমরা দুজনেই তোর বাবাকে আজাদ হিন্দ করে তুলেছি। তোর ঠাকুমা আজ নেই, থাকলে জিজ্ঞেস করতি আমি কি ভাবে তোর বাবাকে আগলে রেখেছি সারাটা জীবন ....." ।

কথা আর শেষ হলো না। কান্নার শব্দে ঘর ভরে গেলো। অনেকক্ষণ পরে শুধাংশুশেখর তাকালেন রবির দিকে।।

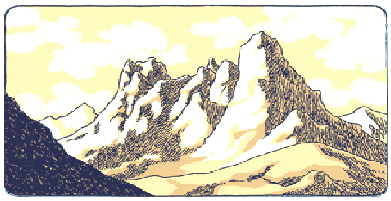

Noida, 11th Nov, 1996